গ্রাউন্ড জিরো

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

মৌলি যেদিন প্রথমবার এ বাড়িতে এল, তখনও বাবা বেঁচে। কলেজের বন্ধবী, নোটস নিতে এসেছে বলে প্রথম দফায় বাবা-মা-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অর্পন। কৃষ্ণনগরে আদি বাড়ি শুনে মৌলির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল বাবা। বাবারও যে আদি বাড়ি সেই কৃষ্ণনগর। মৌলি চলে যাবার পর মাকে নাকি বলেছিল, 'ভারি মিষ্টি মেয়ে। আসলে কৃষ্ণনগরের লোকজনই একটু উচ্চ বংশের হয়।' মৌলিকে অর্পনের বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে দেখলে বাবা বোধহয় একটু বেশি খুশি হত বলেই ধারণা অর্পনের। আর পাকাপাকিভাবে মৌলিকে যেদিন এ বাড়িতে নিয়ে এল ও, মা সেদিন হাত ধরে প্রথমে নিয়ে গেছিল বাবার ছবিটার কাছে। বলেছিল, ওঁকে প্রণাম কর সবার আগে। বাবার ছবিতে তখনও একটা রজনীগন্ধার মালা ঝুলছে। একদিনের বাসি। সদ্য রঙ করা, পুরোনো দেওয়াল থেকে ঝুলতে থাকা বাবার ছবিটা থেকে অর্পনের মনে হয়েছিল, বাবা হাসছে। এখনই বলবে, 'ভাল করেছিস রে পলু। কৃষ্ণনগরের মেয়ে। উঁচু বংশ হবেই।'

বাইরের ঘরটা পেরিয়েই বড় উঠোন। বিয়ে উপলক্ষ্যে পুরোটাই রঙিন সামিয়ানায় ঢাকা। উঠোনের আনাচে কানাচে মায়ের লালন পালনে বেড়ে ওঠা কাঁঠাল, পেয়ারা আর আমগাছের গা দিয়ে ঝোলানো হয়েছে সামিয়ানা। সামিয়ানা ছাপিয়ে মাথা তুলে বড় সব গাছগুলো। শুধু করমচা, টগর ফুলের গাছ আর কিছু ফুলের টব ছিল সামিয়ানার নিচেই। কেউ টুনি বাল্ব দিয়ে সাজিয়েও রেখেছিল টগর আর করমচা গাছ দুটো। উঠোনেই পথ আটকে ছিল দিদিরা, মামাতো বোনেরা। বউকে নিয়ে ঘরে ঢোকার আগে তাদের দক্ষিণা চাই। সেটা নাকি দরজা খুলে দেওয়ার বকশিস। তাদের সামলে তারপর অর্পনদের বাড়িতে প্রবেশ। মা, কাকীমা, দিদিরা শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে নতুন বউকে ঘরে তুলেছিল। মৌলির মাথায় তখনও বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা দু'চারটে দুব্বো আর ধান। গালের পাশে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জল, ধুয়ে যাওয়া কাজল আর অনেকটা ক্লান্ত। তারই মধ্যে কানের পাশে ফিসফিস করে বলেছিল, 'এটা আজ থেকে আমারও বাড়ি।'

মায়েরা, দিদিরা কেউ শুনতে পায়নি। অর্পনই শুধু শুনেছিল। মা বলত, 'এক মাটির গাছকে তুলে এনে অন্য মাটিতে লাগানো। শিকড় ধরে নিলে খুব ভাল। না হলে গাছ ক্রমশ শুকিয়ে যায়। কত ভাল ভাল মালি ফেল করে যায়।' মৌলির শিকড়টা অবশ্য এই মাটিতে দ্রুত ধরেই নিল। মায়ের উঠোনে গাছের সংখ্যা যত বাড়তে থাকল, ততই যেন মৌলির শিকড়ও এই মাটি গভীরেই পৌঁছে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কোলে আলো করে ছেলে। দু'বছর পর আবার একটা মেয়ে। বাড়িটা অনেকদিন পর আবার জমজমাট। বাবা মারা যাবার পর খালি হয়ে গেছিল কেমন যেন ঘরটা। মা আর ছেলের সংসার। বাবা বেঁচে থাকতেই দুই দিদির বিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ছেলে মেয়েদের নিয়ে ওরা বাপের বাড়ি এলে

তবেই একটু হইচই, লোকজনের কথাবার্তা। তা না হলে বাড়িতে আর কথা বলার লোক কোথায়! অফিস সেরে অর্পনের বাড়ি ঢুকতেই প্রায় রাত ন'টা। মা তখন একা একাই টিভি সিরিয়াল দেখছে। খাবার বাড়তে বাড়তে দু'চারটে কথা। তারপর যে যার ঘরে। অর্পন দোতলায়। মা একতলায়, নিজের ঘরে। আবার সকালে অফিস যাবার তাড়া। মা রান্নাঘরে কাজের লোকের সঙ্গে ব্যস্ত।

ব্যাঙ্কের চাকরিতে জয়েন করার পরই অবশ্য দিদিরাই জোর করতে থাকল, 'ভাই, বিয়েটা এবার সেরে ফেল। মা সারাদিন একা বাড়িতে থাকে। আমাদের খুব চিন্তা হয়।' তাড়া অবশ্য অর্পনেরও ছিল। মৌলিকে আর অপেক্ষা করানোর কোন ইচ্ছাই ছিল না ওরও। বিয়ের আগে বাড়িটায় আবার রঙ হয়েছিল। ভিতরে, বাইরে। পুরোনো বাড়িটায় সোঁদা দেওয়ালগুলোয় আবার নতুন রঙ আর হোয়াইটওয়াশের গন্ধ। নুন ধরা, পলেস্তার খসে পড়া দেওয়ালগুলোয় আবার সিমেন্টের আস্তরণ। বাগানটার একদিক পরিস্কার করে প্যান্ডেল হয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও সেখানে। বাবা মারা যাবার পর থেকে বাগানটার দেখাশোনাই প্রায় হয়নি। ওটা আসলে ছিল বাবার ডিপার্টমেন্ট। আম থেকে নারকেল সব কিছু নিজের হাতে বসানো। পরিচর্যাও ছিল নিজের। গরমকালে গাছে আম ধরলে মেয়ে জামাইদের ডেকে পাঠিয়ে পাকা আম খাওয়ানো ছিল বাবার বছরের সেরা খুশি-মুহূর্ত। বাবা চলে যাবার পর বাগানটা সত্যিই বড়ই অবহেলায় ছিল। আগাছা বাড়ছিল। মা প্রায়ই বলত, 'পলু, ওই বাগানে একদিন সাপ বের হবে দেখিস। কী হাল হয়েছে বাগানটার দেখেছিস?' অর্পন দেখলেও করার কিছু নেই। বিদেশি ব্যাঙ্ক, নতুন চাকরি। মাঝে মাঝে রবিবারও ছুটতে হয় সল্টলেক। সময় কোথায়! বিয়েতে অবশ্য সব পরিস্কার হল। ওখানে বাঁশ পড়ল। প্যান্ডেল হল। লোকজন খেল।

অর্পনের নতুন অফিস থেকে চার পাঁচজন এসেছিল বিয়েতে। তাপসদা বেশ সিনিয়র সহকর্মী। রীতিমত চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এত বড় বাড়িটা সবটা তোমাদের? নাকি শরিক আছে?' সব্যসাচী উত্তরটা দিয়েছিল, অর্পনকে বলতে না দিয়ে। 'সে কী তাপসদা, আপনি জানেন না অর্পনেরা এই অঞ্চলের জমিদার! এই অঞ্চলে আরও গোটা পাঁচেক বাড়ি আর জমি আছে অর্পনদের। গড়িয়ার ফ্ল্যাটে থেকে আর জমিদার চিনবেন কী করে!' রসিকতা থামাতে হল অর্পনকেই। 'না তাপসদা। এই একটাই বাড়ি। তবে শরিক নেই। বাবা নিজে জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছিলেন তাও প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন এসব অঞ্চলে জমি খুব সস্তা। এখন অবশ্য হাত ছোঁয়ানোর মুস্কিল।' তাপসদার উৎসাহ তখনও কমছিল না। পাল্টা প্রশ্ন ছিল, 'এখানে এখন জমির দাম কত যাচ্ছে?' পিছনে লাগার আরেকটা সুযোগ হাতছাড়া করল না সব্যসাচী। 'দেখেছিস, গড়িয়ার ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলায় তাপসদা সঙ্গে সঙ্গে সোদপুরে জমির খোঁজ করছে। অর্পন নয়, এরপর দেখবি তাপসদাই সোদপুরের জমিদার।' সবার হাসাহাসির মাঝেই অর্পন তাপসদার প্রশ্নের উত্তর দিল। 'প্রচুর দাম তাপসদা। আমি যা শুনেছি, দশ লাখের কম নয়। এক কাঠা।' 'দশ লাখ! সোদপুরে!' তাপসদার গলায় বিস্ময়।

অর্পনের নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগে। গত পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে গোটা এলাকাটা

যেন পুরো বদলে গেল। রেল স্টেশানের বাইরে এলেই বদল আর বদল। বড় বড় শপিং কমপ্লেক্স। বিটি রোড পার হলেই বিশাল বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্স। ওদের পাড়ার স্কাইলাইনটাই তো বদলে গেছে। রাস্তার দু'ধারের সেই পুরোনো পুরোনো একতলা, দোতলা বাড়ি আর কোথায়! কোনটার গায়ে রঙ নেই, কোনটায় ইঁটের গাঁথনি আর কোনমতে ছাদ ঢালাইয়ের পরই বসবাস শুরু হয়ে গেছে। দেওয়ালগুলোয় অনেক পুরনো লিখে রাখা শ্লোগান। হাত চিহ্নে ভোট দিন হলে নীল, সাদা, সবুজ, কমলা অনেকগুলো রঙ। চুনকাম করা কোন কোন দেওয়ালে লাল রঙে লেখা, মেহনতী মানুষের প্রতীক। পাশে একটা লাল কাস্তে হাতুড়ি তারা। আবার কোন দেওয়ালে আলকাতরায় লেখা, নকশালবাড়ি। দেওয়ালগুলো সেই বাড়িগুলো সব উধাও হয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে সার দেওয়া অন্য বাড়ি। চারতলা, পাঁচতলা। ঝাঁ চকচকে। বাহারি রঙ। তলায় ছোট গ্যারাজ। কোনটায় সাটার ফেলা দোকানের বন্দোবস্ত। পাড়ার ভিতরেই রোল, চাউমিনের দোকান হয়েছে অনেক। এসব স্ট্যান্ড অ্যালোন বিল্ডিং। ছোট জমিতে নয় দশটা পরিবারের বসবাসের সংস্থান। এই বন্দোবস্তে খেলার মাঠের বন্দোবস্ত থাকবে না। সুইমিং পুল কিংবা কমিউনিটি সেন্টার কোনকিছুরই প্রত্যাশা করা যাবে না। কিন্তু মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার মধ্যে স্বপ্নপূরণ এই ফ্ল্যাটগুলো। অর্পনদের পাড়ায় রাস্তার দুধারে এখন এরকম বিল্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। পাড়ায় নতুন নতুন মুখ। দূর্গাপুজোর কমিটিতে অচেনা নাম।

এই পাড়াতে জন্ম থেকে আছে অর্পন। বাবা যখন জমি কিনে বাড়ির কাজে হাত দিয়েছিল, তখনও অর্পনের জন্মই হয়নি। শুধু বড়দিদি তখনও মায়ের কোলে। বাবা বলত, এই পাড়ায় নাকি তখন কয়েক ঘর মানুষ। বাকিটা শুধুই বাগান আর পুকুর। অর্পনের নিজের ছোটবেলাতেও মাঠ আর পুকুরের স্মৃতি অনেক। বিটি রোডের গা বরাবর ফ্যাক্টরির শেডগুলোর গা ঘেঁষেই একটা করে মাঠ। শীতকালে ফ্যাক্টরির সকালের সাইরেনের সঙ্গেই শুরু হয়ে যেত ওদের ক্রিকেট ম্যাচ। এক পাড়া বনাম অন্য পাড়া। এক মাঠ থেকে অন্য মাঠ। মাঠগুলো অবশ্য এখন ওই ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাক্টরির শেডগুলো থেকে আর সাইরেনের শব্দ শোনা যায় না। কয়েকটা আবার একেবারে ভ্যানিশ। কোন একজন পি সি সরকার এসে কারখানাকে বদলে দিয়েছে আস্ত একটা আবাসনে।

খুব একটা খারাপ লাগে না অর্পনের। পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতেই হবে। উন্নয়নের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবারও কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না ওর। ভাল কিছু কেনাকাটার জন্য আর কলকাতা দৌড়াতে হয় না অর্পনদের। সব কিছু হাতের কাছে ওদেরও। ছেলে মেয়েরা ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে এখানেই। বেশ কিছু কিলোমিটার পার হয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষমেশ দমদম কিংবা ব্যারাকপুর যাবার প্রয়োজন আর নেই। নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলো হাতের কাছে এলে জমির দাম, ফ্ল্যাটের দাম বাড়বেই এটা তো অর্থনীতির সহজপাঠ। বিদেশি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার অর্পন গুহ বোঝে এই সহজ বিষয়টা। মন থেকে মানে, উন্নয়নের জন্য শিল্প চাই। শিল্পের জন্য জমি চাই। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে যখন জমি নিয়ে বিতর্ক, চাষীদের জমি নিয়ে শিল্প হবে কিনা এ নিয়ে সরগরম, ব্যাঙ্কে অনেকের মতই অর্পনও বলেছিল, 'জমি ছাড়া ইন্ডাস্ট্রি হবে কী করে বলতে পারো? টাটার

মত কোম্পানি শেষমেশ ফিরে যাবে! বেঙ্গলের আর কিস্‌স্যু হবে না। আর কেউ আসবে না এখানে। লিখে দিলাম।' সমর্থনই ছিল বেশি মানুষের। ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে গেলে তো জমি লাগবেই, অনেক রাত অবধি সহকর্মীদের বিতর্কে সেদিন সরগরম বিদেশি ব্যাঙ্ক।

বাড়িতেও সে নিয়ে যত তর্কবিতর্ক। বড় জামাইবাবু রাজনীতি ঘেঁষা মানুষ। ছাত্রবেলায় নাকি সক্রিয় বাম রাজনীতি করতেন। বাম মানে অতি বাম। নকশাল। এখন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার। তবু এখনও কথায় বার্তায় রীতিমত বিপ্লবের গন্ধ। অর্পন অবশ্য মাঝে মাঝে তা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। 'আপনি ছাড়ুনতো জামাইবাবু। করেন সরকারি চাকরি, মাস গেলে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড মোটা টাকা মাইনে দিচ্ছে। আর সরকারকেই সুযোগ পেলে গালাগালি দিচ্ছেন।' জামাইবাবুও উত্তর দেন, 'ভায়া, তোমার দিদি সেসময় যদি প্রেমে না পড়ত, তাহলে গোটা দেশকে বুঝিয়ে দিতাম, বিপ্লব কাকে বলে!' মুখ ঝামটা দিয়ে সরে যায় দিদি। 'পলু, ওর কথা শুনিস না। বিয়ের আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে উলুবেড়িয়া থেকে সোদপুর ডেইলি প্যাসেঞ্জারি আরম্ভ করে দিয়েছিল।' অর্পন সুযোগ ছাড়ে না। 'হ্যাঁ সে জন্যই তো আমাদের দেশে আর বিপ্লব দীর্ঘজীবি হল না। তার অকাল প্রায়ান দেখতে হল।' জামাইবাবু অবশ্য এবার বেশ সিরিয়স। 'বিপ্লব কাকে বলে এবার বুঝবে, বুঝলে। জনগনকে ৩৪ বছর ধরে জনগনতান্ত্রিক বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে রাখা এবার বেরিয়ে যাবে। বুঝবে কত ধানে কত চাল। এতগুলো মানুষকে উৎখাত করে নাকি শিল্প হবে। মাইলের পর মাইল চাষের জমি দখল করে নাকি গাড়ির কারখানা হবে!'

প্রতিবাদ করে অর্পন। 'কারখানাটা কি হাওয়ায় হবে? শূণ্যে হবে? আমাদের স্টেট ইন্ড্রাস্ট্রি দরকার। আর ইন্ড্রাস্ট্রির জন্য জমিও দরকার। আপনি জানেন কত লোকের চাকরি হবে? যাঁদের চাষের জমি চলে যাবে বলছেন, উৎখাত হবে বলছেন, তারাও ক্ষতিপূরণ পাবে, চাকরি পাবে।' জামাইবাবু দমলেন না। 'কী বলছ পলু? চাকরি দিয়ে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণা ভোলাবে! আসলে নিজের ভিটে ছাড়ার যন্ত্রণা তো তোমরা বোঝো না। আমার বাবাকে দেখতাম, বৃদ্ধ বয়সেও বাংলাদেশের বাড়ি নিয়ে চোখের জল ফেলত। নিজের বাড়ি, নিজের মাটিকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে আসা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ওদের না হয় উপায় ছিল না। কিন্তু এটা কী? তোমায় যদি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়, পারবে ছেড়ে যেতে?' অর্পনের উত্তর তৈরিই ছিল। 'কেন পারব না? যদি ভাল টাকা পয়সা পাই, বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা পাই, কেন পারব না?' জামাইবাবু একটু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু অর্পন নিজের যুক্তিগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পারছিল। 'আসলে আমরা প্রতিদিন ভাল থাকার জন্য বাঁচি। প্রতিদিনের এই লড়াই, চারপাশে মানুষে মানুষে এত সম্পর্ক সবটাই ভাল থাকার জন্য। আমাদের নির্ভরতাগুলো চারটে দেওয়াল কিংবা বাড়ির ছাদের ওপর হয় না, হয় ওই চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা মানুষগুলোর ওপর।'

জামাইবাবু একটু যেন থমকে গেছিলেন। সন্তর্পনে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এই বিতর্ক থেকে। 'কে জানে, তোমরাই হয়ত ঠিক। তোমাদের মত আমরা ভাবতে পারছি না।'

সেদিন রাতেই রিকের জন্মদিন। অর্পনের ছেলে নয় বছরে পা দিল। ছেলে মেয়ের

জন্মদিনে দুই দিদির ফ্যামিলিকেই বাড়িতে ডাকে অর্পন। সঙ্গে আসে ছেলে মেয়ের বন্ধুরা। বছরের এই দুটো দিন মিস করতে চায় না মৌলিও। যত সমস্যাই থাকুক, মৌলি এই দুটো দিন একটু আলাদাভাবে পালন করতে চায়। এবারও রিকের বন্ধুরা সব আসছে রাতে। তাদের জন্য রিটার্ণ গিফট, রিকের আবদারের ক্রিকেট সেট কিনতে বিকেলে বেরিয়েছিল অর্পন। সঙ্গে রিক। ব্যাট বল উইকেটটা অন্তত এবার নিজের হাতে কিনতে চায় ও। বাড়ির বাগানেই রিকের ক্রিকেট পিচ। নিজেই ব্যবস্থা করে নিয়েছে খালি একফালি জায়গাটা। পাড়ায় ওর বয়সি কয়েকজন যোগাড়ও করে নিয়েছে নিজেই। বাগানেই রোজ ওদের ক্রিকেট ম্যাচ। ফুল নষ্ট হয়, গাছের ডাল ভাঙ্গে বলে অর্পনের মা একটু চেঁচামেচি করেন মাঝেমাঝে, কিন্তু অর্পনই বারণ করে মাকে। 'কোথায় যাবে বলতো ছেলেগুলো? পাড়ায় একটাও মাঠ আছে মা? বিকেলবেলা একটু খেলবেই বল। আমরা কত খেলতাম। তখন মাঠ ছিল চারদিকে। প্রবলেম হত না। রিকদের তো সেই সুযোগ নেই।' সমাধান খোঁজে মৌলি। 'ওর যখন এত ক্রিকেট খেলার শখ, কোন আকাডেমিতে ভর্তি করে দাও। এখানে কত ছেলে তো পিঠে ব্যাট ঝুলিয়ে বাবার সঙ্গে যায় দেখি। নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও ক্রিকেট ক্যাম্প আছে।' অর্পন দেখছি বলে আশ্বস্ত করে মা, বউ দুজনকেই।

অর্পনের নিজের অবশ্য বেশ লাগে বাগানের এই ক্রিকেট পর্বটা। মনে পড়ে নিজের ছোটবেলাটা। অর্পন তখন আরও ছোট বড়পিসির ছেলে তরুনদা আসত প্রায়ই। তরুনদা ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিল। পিসি আসত শান্তিপুর থেকে। প্রতিটা গরমের ছুটি পুজোর ছুটিতে পিসি একবার আসতই বাড়িতে। বাবাকে দেখতে। পিসির সঙ্গে তরুনদা আসত হাজার রকম নতুন খেলা নিয়ে। বাগানটা যেন ওদের দুজনের ট্রেজার আইল্যান্ড ছিল। গরমের দুপুর। মা, পিসি দুজনই ঘুমোচ্ছে, পা টিপে টিপে বের হয়ে দুজনই চলে যেত বাগানে। আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে যখন নতুন খেলার প্ল্যান হচ্ছে, তখনই আকাশ কালো করে আসত। অর্পনের ভয় করত। তরুনদাই প্রথম বলেছিল। 'দাঁড়া এখানে ঝড় আসছে। কালবৈশাখি। এখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। অনেক আম পাবি। ঝড়ে গাছ থেকে পড়বে।' অর্পন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে থাচ্ছে ঝড়। গাছগুলি মাটিতে নুইয়ে পড়ছে। টপটপ করে আম পড়ছে মাটিতে। হঠাৎই মায়ের চিৎকার শুনে ঘরে ফিরে আসা। সেই প্রথম কালবৈশাখি দেখেছিল অর্পন। আর তরুনদা কতগুলো ছোট ছোট বরফের টুকরো তুলে তুলে দেখিয়েছিল, 'এই দেখ, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বললাম, বাগানে আরেকটু থাক। শিলা বৃষ্টি দেখতে পারতিস।'

সেদিন রাতে, হঠাৎই তরুনদার প্রস্তাব শুনে মনে হয়েছিল মাথায় আঝোরে শিলাবৃষ্টিই হচ্ছে। মেরুদন্ড দিয়ে নেমে আসছে ঠান্ডা রক্তের স্রোত। তরুনদা এখন কলকাতায় থাকে। নিজস্ব ব্যবসা। বেশ বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। কলকাতায় ওদের কোম্পানি বেশ কয়েকটা বড় প্রজেক্টের কাজ করছে। এখনও চলছে বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট। এত ব্যস্ততা সত্বেও অর্পনের সঙ্গে বন্ধুত্বটা এখনও আগের মতই রেখে দিয়েছে তরুনদা। প্রজেক্টের কাজে কখনও কখনও কলকাতার বাইরে নৈহাটি, কল্যাণী দৌড়াতে হয় তরুনদাকে। যাতায়াতের পথে এখনও ঠিক মামার বাড়ি ঘুরে যায়। রিক-রুম্পির জন্মদিনেও চলে

আসে বড় কোন কাজে আটকে না গেলে। সেদিন জন্মদিনের পার্টির ফাঁকেই তরুনদা বলেছিল, 'আচ্ছা, তুই বাড়িটা কোন ডেভেলপারকে দিয়ে দিচ্ছিস না কেন? তোদের যা জায়গা, তাতে অন্তত দু'তিনটে ফ্ল্যাট পাবি। সেগুলো কাজে লাগাতে পারবি। ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী টাকাও পাবি। ভেবে দেখতে পারিস।' চমকে উঠেছিল অর্পন। চারপাশে অনেক পুরোনো বাড়ি এভাবে বদলে গেলেও ওর কাছে এই প্রস্তাব কখনও আসেনি। অবাক হওয়া মুখটা দেখে তরুনদাই বলে যাচ্ছিল, 'দেখ, এত বড় বাড়ির পুরো মেইনটেন্সের দায়িত্ব তোর ঘাড়ে। কী করে সামলাবি। বাড়িটা পুরোনো হচ্ছে। খরচ বাড়বে। আর তুই একা ছেলে। এত বড় বাড়িতে তোর কী হবে! কী কাজে বল তো এত বড় বাড়িটা? বরং কোন ভাল লোকাল প্রমোটারকে দিয়ে দে। অনেক বেনেফিট পাবি।' কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না অর্পন। তবুও কথার প্রত্যুত্তরেই বলল, 'লোকাল প্রোমোটারদের দেব না তরুনদা। তোমরা করলে দিতে পারি।''আমরা তো স্ট্যান্ড অ্যালোন প্রজেক্ট করি না। তবু দেখছি। তোকে জানাব দু'একদিনের মধ্যে।' তরুন কলকাতা রওনা হবার আগে জানিয়ে গেল।

এই দু'একদিনটায় ঝড় বয়ে যাচ্ছিল অর্পনের মধ্যে। রাজি হয়ে যাবে তরুনদার প্রস্তাবে? মা কিছু বলল না, শুধু বলল, 'ভেবে দেখ। সত্যিই তো এতবড় বাড়ি মেইনটেন করা শক্ত কিন্তু তোর বাবা করে গেছেন, তাঁর স্মৃতি। এটাই যা পিছুটান। দেখ, যা ভাল বুঝিস।' মৌলি তরুনদার প্রস্তাব শোনার পর থেকেই ফ্ল্যাটের পক্ষে। রাতে সবাই চলে গেলে তরুনকে বলেছিল, 'ভেবে দেখ, এরপর রিক-রুম্পির হায়ার স্টাডিজের ব্যাপার আছে। কিছু টাকা যদি ওদের নামে এখন রেখে দেওয়া যায় অনেক সুবিধে হবে।' অর্পনও যেন এমনটাই ভাবছিল। টাকাটার দরকার প্রতিদিনই যেন নতুন করে বুঝছে, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আরও কিছুটা সঞ্চয় থাকলে বেশ সুবিধা হত। রিক-রুম্পিরা বড় হচ্ছে। নিজেরও চাকরির বাজার বেশ অনিশ্চয়তায় ভরা। বিদেশি ব্যাঙ্কগুলো প্রতিদিন লোক ছাঁটাই করছে আর্থিক মন্দার দোহাই দিয়ে। টাকা বেশ দরকার অর্পনের।

মায়ের 'যা ভাল বুঝিস'এ অন্তত চূড়ান্ত অসম্মতি নেই, সেটা বুঝেছিল অর্পন। তরুনদাকে তাই টেলিফোনে 'হ্যাঁ'-ও বলে দিয়েছিল দু'একদিনের মধ্যেই। তরুনদা বলেছিল, 'তোদের বাড়ির দলিল আর বাকি কাগজপত্র লাগবে। একদিন নিয়ে চলে আয়। আমি সার্চিংটা করিয়ে নিই।'

এলাকায় একটা ভাড়া ফ্ল্যাটে অস্থায়ী ব্যবস্থা তরুনদারাই করিয়ে দিল। এটাই নাকি নিয়ম। নতুন প্রজেক্টে তিনটে ফ্ল্যাট পাচ্ছে অর্পন। সঙ্গে কিছু টাকাও। দিদিরা জানিয়েছে, ওদের কিছু দরকার নেই। অর্পন তবু বেশ কিছুটা টাকা ফিক্সড করে দিয়েছে দুই দিদির নামেই। যেদিন বাড়িটা ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে যাচ্ছিল, সেদিনও কিছু মনেই হয়নি অর্পনের। একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। আবার তো ফিরে আসবে এই মাটিতেই। মাকেও তাই বলেছিল। রিক-রিম্পিকেও তাই। 'ম্যাক্সিমাম এক বছরের মধ্যে আবার ফিরে আসব। তরুনদারা খুব বড় কোম্পানি মা। তুমি ভাবতে পারবে না, তোমার ভাগ্নে কী কাজ করছে। ঠিক নামিয়ে দেবে।' তরুনদা পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল। 'না গো মামি। অর্পনটা যে কী বলে! তবে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলব কাজটা।' শিফটিংয়ের পর আর কয়েকদিন আসা হয়নি পুরোনো

পাড়ায়। নতুন পাড়াটা রেল স্টেশনের একেবারে পাশে। সকালে অফিসের তাড়ায় সোজা স্টেশন, আর রাতে বাড়ি। সময়ই পাচ্ছিল না অর্পন। তরুনদা এর মধ্যে ফোনে জানিয়েছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত কাজও চলছে। বাগানের ক্রিকেটটা বন্ধ হওয়ায় রিককে একটা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি করতে হয়েছে। দুটো রবিবার ওকে নিয়েই কেটে গেছে। পরের রবিবার বাড়ির কাজ দেখতে যাবে ঠিকই করে রেখেছিল অর্পন। 'তোমার প্রজেক্ট ম্যানেজারকে বলে দিও যাতে ঢুকতে দেয়।' তরুনদাকে ফোনে জানিয়েও দিয়েছিল অর্পন। পরের রবিবার রিককে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে গেছিল অর্পন।

না, বাড়ির অবধি পৌঁছাতে পারেনি। আগেই সাইকেলটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্ট, দমবন্ধ করা একটা অনুভূতি। ওদের বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছিল না। নাটকের সেটের মত দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দরজাটা। কাঠের পাল্লা একটা ফ্রেমে ঝুলছে। বাকিটা শূন্য। কোথাও কিচ্ছু নেই। ভাঙ্গা বাড়ির আবর্জনা পরিস্কার করছেন কয়েকজন শ্রমিক। শূন্যতা এত ভয়ঙ্কর হয় জানা ছিল অর্পনের। বাড়ির মধ্যে যেতেই যেন ভয় করছিল অর্পনের। গোটা শূন্যতাটা যেন ওকেই গিলতে চলে আসছে। গুটিগুটি পায়ে তবু এগোল অর্পন। মায়ের তুলসী মঞ্চটা উপড়ে মাটিতে ফেলা আছে। ওটাই চেনাল মায়ের প্রিয় উঠোনটা। বাবার বাগানে গাছগুলো উধাও। রিকের ক্রিকেট খেলার পিচটা খুঁজছিল অর্পন। পেল না। ওর, তরুনদার সেই আমগাছটা, যার নিচে দাঁড়িয়ে প্রথম কালবৈশাখী দেখেছিল অর্পন? না সেটাও কোথাও নেই। পড়ে শুধু ভাঙা সিমেন্টের চাঙ্গর, ইট, লোহা কংক্রিট, আবর্জনা।

ওয়র্ল্ড ট্রেড সেন্টারের গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়িটাকে এখন গ্রাউন্ড জিরো বলে আমেরিকানরা। অর্পনের হঠাৎ মনে হচ্ছিল, শূন্যর সঙ্গে শূন্যতার কি আদৌ কোন সম্পর্ক আছে? সংখ্যা কি আদৌ সব কথা বলতে পারে? গ্রাউন্ড জিরো কি আদৌ বলতে পারে আর্তনাদ, যন্ত্রনা, হারিয়ে ফেলার সব কাহিনী? শূন্যে দাঁড়িয়ে শূন্যতাকে বড্ড নৃশংস মনে হচ্ছিল অর্পনের। এই শূন্যতায় মিশে গেছে বেড়ে ওঠার দিনগুলো, ওদের মধ্যবিত্ত জীবনযাপন। এই ধূলোয় ঢাকা পড়ে গেছে ওর স্মৃতির প্রতিটা রাস্তা। চারপাশে সব ধূলো, সব আবর্জনা নিজের হাতে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল অর্পনের। ফিরে পেতে ইচ্ছে করছিল সেই নোনাধরা দেওয়াল, লাল মেঝের প্রতিটা ইঞ্চিকে। কিন্তু শূন্যতা বোধহয় সবটা গ্রাস করে নেয়! একটু যেন ভয়ও পাচ্ছিল অর্পন। কে জানে কেন! সাইকেলটা তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ও!